OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 75
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 68 - 75
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

জয়া গোয়ালার ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় জীবন

রেশ্মী বীর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম
Email ID : birreshmee4@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Jaya Goyala, short stories, Tripura, lower class, protest-rebellion, regional, literature.

Abstract
The wall of discrimination between the upper and lower classes in society has been present since ancient times. As a result, the concept of dominance and subordination creates unequal conflicts in the human psyche. The exclusive dominance and self-interest of the upper class often affect the lives of the lower class. This leads to rebellion among the lower class. Recently, the status of the lower class in society has been highlighted in the various branches of Bengali literature. In this context, the short story writer of Tripura, Jaya Goyala (1966-2014) are notable. Her father, Mangal Goyala, was a laborer in the Monatala tea garden of Tripura. Jaya Goyala, who spent her childhood among the laborers, adopted their 'Chilomilo' dialect and became one of them. She was familiar with their joys, sorrows, struggles, and crises. Her writings reflect the language, life, existence, and experiences of the Bengali-tribal-indigenous people of the Northeast. Even in the 21st century, Jaya Goyala's stories narrate the lives of these marginalized people who are far behind in terms of economic and social progress. She has portrayed the lifestyle of people living far away from the light of civilization. This paper discusses Jaya Goyala's short stories about the marginalized people of this region.

Discussion

(এক)

ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন জনপ্রিয় কথাকারের নাম জয়া গোয়ালা (১৯৬৬ - ২০১৪)। ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার’-এ সম্মানিত এই কথাসাহিত্যিকের জন্ম পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের একটি চা-বাগানে। তাঁর বাবা মঙ্গল গোয়ালা ছিলেন মনতলা চা-বাগানের মজুর। একজন চা-শ্রমিকের মেয়ে হওয়ায় একাদশ শ্রেণির বেশি তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগোতে পারেননি। কিন্তু জীবন-শিক্ষার বলে তিনি যেভাবে দারিদ্রের নির্মম রূপটিকে সাহিত্যের পাতায় প্রকাশ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য বটে। জয়া গোয়ালা ছিলেন একাধারে কবি, গল্পাকার, ঔপন্যাসিক। অবহেলিত অবজ্ঞাত জাতি, উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবন-সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। ত্রিপুরার অরণ্যকেন্দ্রিক পার্বত্য ভূমিতে বসবাসরত মানুষের প্রতি শহরকেন্দ্রিক মানুষের অবহেলা তাঁর মরমী মনকে বারবার ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছে। বিগত শতকের শেষের দিকে পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় প্রায়ই লেগে থাকতো জঙ্গি-হামলা ও নানা অবৈধ প্রচার। এই বিষয়গুলির প্রতি দেশের

সরকারের যে অনৈতিক দৃষ্টিকোণ সেগুলিও জয়া গোয়ালার সাহিত্যকৃতিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সাহিত্য যে সমাজের দর্পণ একথাটি জয়া গোয়ালার শিল্পকলায় ষোল আনাই দেখা যায়। কোনো কিছুই সেখানে গোপন থাকেনি। বাস্তবে যেমনটা আছে ঠিক সেভাবেই বিষয়কে সাহিত্যের পাতায় তুলে আনতেন তিনি। আত্মশক্তির বিপুল স্বাতন্ত্র্যবোধই জয়া গোয়ালার গল্পের কাহিনি ও চরিত্রকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। তাঁর অকালমৃত্যু উত্তর-পূর্বের বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় দীর্ঘশ্বাস।

জয়া গোয়ালা তাঁর রচিত সাহিত্যে ত্রিপুরার চা-বাগানের শ্রমজীবী মানুষদের নিজস্ব 'ছিলোমিলো' ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় সেই ভাষাকে 'বাংলা নির্ভর বিভাষা' বলা হয়। শ্রমজীবী মানুষের মুখের ভাষায়ও যে গভীর বোধশক্তি রয়েছে, তা জয়া গোয়ালার লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনার ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বনামধন্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন -

> "ভদ্র পাড়ার মাপজোক করা হিসেবি মন দিয়ে নিষ্ঠ সাহিত্যের পড়ুয়ারা জয়ার দুনিয়াকে বুঝতেই পারবেন না। কেননা সেই বাস্তবে কোনো ইচ্ছাপূরণের উপযোগী মনোরঞ্জক নির্মাণকলা নেই। মায়া নেই। আত্মপ্রতারণা নেই। আনন্দ-বেদনা কিংবা সংকট সংগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই সরাসরি ও প্রত্যক্ষ।"[১]

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণাপত্রটিতে বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক দুইটি পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

(দুই)

> "আমি ভালোবাসি মাটি। বারিপতনে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আর ভালোবাসি মাটির মানুষদের। ধূপের মতো, ফুলের মতো যারা শুধু দিয়ে যায়, পায় না কিছুই, সেই বঞ্চিত লাঞ্ছিত কান্না-স্বেদ-রক্তঝরানো গণদেবতাদের কথাই আমার গল্পের উপজীব্য বিষয়।"[২]

এই ঐকান্তিক স্বকীয়তার পরিভাষ্যে জয়া গোয়ালার ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় জীবন গবেষণাপত্রটির আলোচনা শুরু করা হল।

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ-এর ধারণা তাৎপর্য লাভ করে আসছে। সামাজিক সম্পর্কে মানুষের ক্ষমতাই হল এর মূল কথা। যেখানে প্রভুত্ব ও দাসত্ব নামক এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। ঐতিহাসিক বিবর্তনে সমাজের এই অসম বিকাশ বিভিন্ন জটিল সমস্যা, নৈতিক-অনৈতিক বোধ ইত্যাদি বিষয়কে তুলে ধরে। এর ফলে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মতানৈক্য, আইনগত তারতম্য।

উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুই শ্রেণির অন্তর্গত মানুষের নিজস্ব পরিচয় আছে। মানুষের ক্ষমতালোভী মন উচ্চবর্গের মানুষের চেতনাকে স্বাধীন করে রাখে এবং নিম্নবর্গের মানুষের চেতনাকে করে পরাধীন। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, নিম্নবর্গের মানুষ ভীরু, নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এর নিহিত কারণটি হচ্ছে, শিক্ষার প্রতি তাদের অবহেলা বা অনিচ্ছা। তারা দিন-আনা খেটে খাওয়া মানুষ। এই একবিংশ শতাব্দীতে তাদের বেশির ভাগ মানুষ নিজেদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়। সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা থাকলেও সেই চেষ্টার মধ্যেও যেন কিছুটা খামতি রয়েছে। ফলে এই বর্গের মানুষদের মধ্যে প্রগতিশীল মনোভাব প্রায়ই নির্জীব। কিন্তু সময় বা পরিস্থিতির বিপরীতে নিম্নবর্গের মানুষেরা সামাজিক তথা রাজনৈতিকভাবে সরাসরি বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ করতেও জানে। নিম্নবর্গের মানুষের স্বাতন্ত্র্য এবং পরাধীনতার দ্বৈত চরিত্রটি আজ কেবল মানুষের মুখে মুখে বা রাজনৈতিক কিংবা আইনগত দলিলেই সীমাবদ্ধ নয়। সৃজনশীল মানুষের সাহিত্যিক সাধনাতেও নিম্নবর্গ-চেতনার বিষয়টি গভীরভাবে ফুটে উঠছে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অনেকটাই অবহেলিত, উপেক্ষিত। এক্ষেত্রে জয়া গোয়ালা পার্বত্য ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের জীবন বাস্তবতা ও ছিলোমিলো ভাষাকে বিরাট বাংলা সাহিত্যের দরবারে উপস্থাপন করেছেন যা তাঁর লেখনীকে অনবদ্য করে রেখেছে। একজন সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের নিরালোক জীবন সম্পর্কে তাঁর সত্যবয়ান শিল্পসত্যের গভীর উপলব্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। জয়া গোয়ালার একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হলো 'রক্ত'। নগরের সভ্যতাগর্বী মানুষদের প্রতি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সদের একতরফা ভাব ও ব্যবহারের মধ্যে বৈষম্য বিভেদের চেহারা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 75
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে এই গল্পে। ছিলোমিলো ভাষায় রচিত এই গল্পের চরিত্র মুনিরা বেগমের কথাটিকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার মুনিরা বেগম বলে –

> "পইসাওলা হইল গিয়া মানুষ— হেরারে-এনা গদিত হুতাইবো। আমরা কিতা— আল্লা বিচার কইরো।"[৩]

এই হাসপাতালে রক্ত ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। কখনো তিনশো টাকায় কখনো বা পাঁচশ-ছয়শয়। গুমতি এবং তাঁর স্বামী চা মজুর। তাদের এতো টাকা নেই যে রক্ত কিনবে। তাছাড়া, ঔষুধ-পত্রও এই হাসপাতালে পাওয়া যায় না। এই রকম একটা পরিবেশে যখন অর্থনৈতিক ভাবে সম্বল মানুষরা এসে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করে যায় তখনই গুমতিদের মতো দিন আনা খেটে খাওয়া মানুষগুলির জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ভর্তির দিন তারা বেড পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পরদিন গায়ে জ্বর থাকা সত্ত্বেও সাদা শাড়ি পরা দিদিমণি একজন রক্তের কালো ছোপ লেগে থাকা কম্বল বিছানো ঠাণ্ডা মেঝেতে নামিয়ে দেয় তাদের। কেননা নতুন রোগিনীটি ছিল মালদার। স্যুটেড বুটেড পরিহিত আত্মীয়পরিজন কলকাতার ভাষায় বাংলা কথা বলছিল। দিদিমণিরা বোধ করি তাতেই মোহিত হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার বাঁচার তাগিদে পয়সা দিয়ে রক্ত কিনে। যারা কিনতে পারে না তারা মরে। কেউ কেউ আত্মবিদ্রোহী হয়ে উঠে যেমন গুমতি। কিন্তু তার এই আত্মবিদ্রোহ ক্ষণকালের। এই অঞ্চল ছেড়ে সে কোথায় যাবে। তাকে থাকতে তো হবে এখানেই।

সংযোগহীনতার এই কালো যবনিকা সরিয়ে নেবার জন্য জয়া গোয়ালা এই সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষদের জন্য চালিয়েছেন লেখার যুদ্ধ। তাই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে আত্ম-সচেতনতার ভাবটি প্রখরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'শনিচরী' গল্পের শনিচরী চরিত্রটি এর উদাহরণ। শনিচরী চা-বাগানের পাতা ছেঁড়ার কাজ করে। সে সদ্য মা হয়েছে। কিন্তু বাগানের মালিক এইসব মায়েদের খবর রাখে না। বাগানে কাজ করার সময় একজোড়া ভালো জুতো পর্যন্ত মেয়েদের জন্য দেওয়া হয় না।

> "শনিচরী ভাবে, কী অসহায় ওরা! কিচ্ছু নেই ওদের। মান নেই, টাকা নেই। বুদ্ধি নেই— এমনকি, কি যেন বলে, যা জানলে অনেক কিছু বোঝা যায়—হ্যাঁ, লিখাই-পড়াই। সেই লেখাপড়াও নেই। নিজের দুঃখ-ব্যাথা জানাবার ক্ষমতাও নেই। কী যে জীবন ওদের! অবশ্য জানাবেই বা কার কাছে? কে শুনবে? বাবু? মালিক? ওঃ, ওরা তো ছারপোকা!"[৪]

এই অসম্ভব আত্মগ্লানির মধ্যে দিয়েই তাদের জীবনের চরাই-উৎরাই দেখা যায়। তবে এই শ্রমজীবী মানুষদের আত্মগ্লানি কখনো কখনো 'পাওয়া' গল্পের মালতীর মতো চরিত্রকেও জন্ম দেয়। মালতী আত্মপ্রকাশে বিশ্বাসী। সে তার সমাজের মানুষগুলিকেও আত্মসচেতন করে তুলতে চায়। মালতী অবিবাহিত, বিয়ের উপযুক্ত বয়স সম্বন্ধে সে সচেতন। মালতী তার ভাতিজা ডমরুরকে বিশ-একুশ বছরের আগে বিয়ের জন্য বারণ করে। কিন্তু ডমরুর ভালো লাগে না কথাগুলি। তার সমবয়সী সব বন্ধুদের বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে, কেবলমাত্র সে বাকি। রাগের বশে সে পিসিকে 'ডাইনি' বলে সম্বোধন করে। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন হিসেবে মালতী মজুরদের উপযুক্ত বোনাস সম্পর্কেও সচেতন। কিছুদিন আগে মালতী একটা স্কুলও বানিয়েছে। নিজের সমাজের মানুষের জন্য সে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে দেয়। গাড়ির নরম গদিতে বসে সবকিছু ভেবে একটা আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করে মালতী।

(তিন)

ভারতের স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পর ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবরে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর এই রাজ্যের জনমানসে বিপুল সামাজিক, রাজনৈতিক উত্থান-পতন দেখা যায়। সম্প্রীতির সমারোহে এই রাজ্য যেমন আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে তেমনি বিভিন্ন ধরণের সংকটের সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হয়েছে। বাজার-অর্থনীতির তমসাবৃত জগতে বনজ সম্পদের পাচার পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত জনজাতির জীবনে প্রবল অস্থিরতা ও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জয়া গোয়ালার গল্পে এই সমস্ত বিষয় সমান্তরালভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'তামাশা'

গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। লেংটাবাড়ি গ্রামে বনকর্মীদের সাহায্যে রাতারাতি গাছ কেটে চালান করা হয়। অথচ এই গ্রামের বাসিন্দারা যখন প্রাত্যহিক জীবন ধারণের জন্য জঙ্গলে পড়ে থাকা গাছের ডাল-পালা সংগ্রহের জন্য যায়,

> "তাতেই কী গোঁসা ফরেস্ট-বাবুর! পারলে এই ধরে তো এই মারে। মুংকুরুই বোঝে না এই বাবুগুলো কেন ওদের সঙ্গে এমনি করে! আরে ওরা তো ডাল কাটে পেটের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য।"[৫]

অথচ যারা নির্দ্বিধায় সাইনবোর্ডে লেখে, 'গাছ লাগান গাছ বাঁচান' তারাই রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে নিয়ে যায়। সেই সময় থাকে না পুলিশের লাঠির আওয়াজ কিংবা ফরেস্ট অফিসারদের তীব্র কর্কশ কণ্ঠ।

আদিবাসী লোকভাষা ছিলোমিলোর সূক্ষ্ম আবেদনে জয়া গোয়ালার গল্পের চরিত্রগুলির উত্থান-পতন দেখা যায়। কখনো মালতীর মতো আত্মসচেতন মানুষ আবার কখনো 'লতুন বই' গল্পের রামরতনের মতো অন্ধকার জীবন স্রোতে ভেসে চলা অহেতুক মানুষ। বাবার মৃত্যুর পর চা-বাগানের রেজিস্টারিতে রামরতনের যোগালি কাজের জন্য নাম ওঠে।

> "বাপটা ছিল মালিক-ম্যানেজারের পা-চাটা কুকুর-ই। রামরতনও সেই পথেই হাঁটতে শুরু করে। ম্যানেজারবাবুদের তোষামোদ, বাগান-মজুর আর পাতিয়ালি মেয়েদের সঙ্গে অমানুষদের মতো ব্যবহার, অকাজ-কুকাজ। ...মানুষের কাছে রামরতন মানেই মালিকের দালাল! বাবুদের এঁটোখোর। নেশার আড্ডায় রাত কাটানো শয়তান।"[৬]

এই রামরতন পড়াশোনাকে ভয় করে। শুগনি ও তার স্বামী যখন দুই ছেলের জন্য বাজার থেকে বই কিনে এনে রামরতনকে বলে—

> "না-না, হামরা বহি কিনেছি। লতুন বই। লতুন কেলাসের। বেজান সুন্দন। কত সুন্দর সুন্দর ফটো। দেখবি নানা।"[৭]

তখন রামরতন ভাবে 'লিখাই পড়াই দিয়ে হবেটাই বা কি!' মাতাল রামরতনের শিক্ষার প্রতি এই অবহেলা তাদের মৌলিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে। ফলে অনায়াসে তারা জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নির্ভর করতে হয় অন্যের উপর।

অবিশ্বাস ও সংঘর্ষের মধ্যে বসবাস করা এই অন্ত্যজ সম্প্রদায় কর্মফলে বিশ্বাস করে। 'কম্মফল' গল্পের রাখহরি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সে বলে –

> "কেমন ধম্মকথা। হগ্গল সময় কস, দুঃখ সহ্য হয় না। মালিক আমরারে যাতা কইলে কস কেরে আমরা কথা শুনুম, কোন পাপে? দেখলি নি, কি রাধাকিষ্ণ মন্দিরের পুরোইত ব্যাটা ঠাকুরই গরীব ধনী বানাইছে— আমরা কষ্ট পাই। মাইনষের কথা শুনি, সব পূর্বজন্মের পাপ। সব আমরার কম্মফল, বুজছস।"[৮]

রাখহরি রিক্সাচালক, তার স্ত্রী বকুলী কেরানিবাবুর ঘরের দিনমজুর। এই রাখহরি মালিকের খালি চালাঘরে দুই মানব-মানবীর নিস্তব্ধ নিথর শরীরের অবয়ব দেখতে পেয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, বরং মালিকের থেকে চাওয়া ধার টাকা পেয়েই খুশি হয়। সমাজের এক শ্রেণির মানুষের সর্বগ্রাসী মন রাখহরির মালিকদের মতো শোষণে উচ্ছ্বসিত হয়, অন্যদিকে 'দিন আনা খেটে খাওয়া' রাখহরির মতো মানুষেরা সমাজের চারদিকের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এক সময় তাদেরও এই সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়।

'ঐ শব্দটা' গল্পের রামু চা-ওয়ালা একজন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে তার চায়ের দোকান। এই দোকানে বহু অফিসার, মালিক এমনকি মন্ত্রীর আসা-যাওয়া। রামুর হাতের তৈরি চা খেয়ে তারা সন্তুষ্ট। বছরের প্রত্যেক মাসের শেষে বাকি থাকা টাকার হিসেব তারা রামুর কাছে দিয়ে যায়। সেই হিসাবের ভুল-ভ্রান্তির প্রতি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। তারা সবাই রামুকে খুব বিশ্বাস করে। জানে সে কোনোদিন তাদের ঠকাবে না। রামু হল দিদিমণির বিশ্বাসে তৈরি একজন সৎ মানুষ। কিন্তু শহরের মাস্টারবাবু তথা গল্পের কথক রামুর আদর্শ চরিত্রে বিশ্বাস রাখতে পারেন না। প্রতিনিয়ত তার মনে হয়, রামু যেন হিসাবের খাতায় টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে অধিক পাওনা আদায় করছে। তাই রামুর

দোকানে চা খাওয়ার বাহনায় এসে মাস্টারবাবু রামুর খাতাটি দেখার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনোভাবেই সুযোগ মেলে না। অথচ গল্প কথকের মুখেই স্পষ্ট হয় রামুর অতীত জীবনের কাহিনি। মালিক জগজ্জীবনের ঘরে,

> "গরুবাছুর সামলানো, খুঁটি দেওয়া, এটা সেটা কত যে কাজ করতে হয় ছোট্ট রামুকে, তার ইয়ত্তা নেই।"[৯]

প্রতি রাতে, কখনো দিনের আয়েসী বেলায়, মালিকের বাজখাঁই গলার আদেশ ঠোঁট কামড়ে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছে সে।

> "তারপর পায়খানায় বসে চোখের জলে বুক ভাসানো। ছোট্ট ছেলেটার পায়ুদ্বারে দগদগে ঘা...। সমস্ত সহ্যশক্তি যখন শেষ তখনই সে পালাল।"[১০]

এই পালানোই শেষ নয়। কাজ করতে গিয়ে রামুকে পড়তে হয় গিন্নীমার হাতে। ঐ স্ত্রীলোকটির ইচ্ছের গোলামী করতে বাধ্য হয় রামু। পরাধীনতার জালে সে জড়িয়ে পড়ে। আত্মগ্লানির নির্মম দংশনে পালিয়ে বা মরে গিয়ে সে নিজের জীবনকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। সেই নির্মম সময়টাতেই দিদিমণির সঙ্গে দেখা। দিদিমণির সঙ্গে পরিচয়ের পরই রামু খুঁজে পায় আত্মবিশ্বাস। দিদিমণির দেওয়া সঞ্চয়ের পুঁজি তাকে আজ রামু চাওয়ালায় রূপান্তরিত করেছে। দশজন মানুষ তাকে জানে, বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের ছবিটি যখন গল্পকথক বা মাস্টার মশাই রামুর হিসেবের খাতায় খুঁজে পান তখন মাস্টার মশাইও তাকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করেন।

সহজ সরল অন্ত্যজ মানুষ শত কষ্টের দিনযাপনেও অন্তরে যে বিশ্বাসকে আগলে রাখে, রামু তারই প্রতিবিম্ব। এই মানুষগুলির ইচ্ছা-আকাঙ্খা জয়া গোয়ালা রামুর মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন—

> "হয়। কোনো সময় খুব ইচ্ছা হয়। কত সম্মান, লাল হইয়া যাঅন যায়! কোনো সময় আবার হয়ও না। মন্ত্রী হওন হেঙ্গামের কাম। ভালো মন্ত্রী না হইলে মুশকিল। মানুষের লাইগ্যা ঠিক মতন কাম না করতে পারলে কিয়ের মন্ত্রী নেতা।"[১১]

রামুর এই কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের উপর ক্ষোভ। যে রাষ্ট্র সমতার কথা বলে, সেই রাষ্ট্রের নাগরিক সভ্যতায় রামু, রাখহরি, মালতীদের মতো মানুষকে প্রচুর শারীরিক ও মানসিক শোষণ সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয়।

(চার)

জয়া গোয়ালার গল্পে কোনো বিকল্প বয়ান নেই। মিথ্যা আশ্বাস নেই। ভালো হয়ে যাওয়ার বা হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা নেই। তিনি ত্রিপুরার লড়াকু শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিনিধি। সেই প্রতিনিধিত্ব এসেছে সাহিত্যের হাত ধরে।

> "বাবুরা বলল— আইজ স্বাধীনতার দিন, রোশনাইয়ের দিন... আর হোইদিকে দেখ হামদের মজুর লাইনে সির্ফ আন্ধেরা আর আন্ধেরা।"[১২]

স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর পার হবার পরও নিম্নবর্গের মানুষেরা আজও পরাধীন। পরাধীন নিজের দেশের মানুষের কাছে। নিজেদেরই তৈরি আইনের কবলে আজও তারা অন্যের জন্য খেটে মরে। তাদের মৌলিক সচেতনতার ভার কেউ নেয় না। নিতে চায় না। তারা নিজেরাও নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের মধ্যে যারা একটু সচেতন, তারাই নিজেদের পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। তার উদাহরণ জয়া গোয়ালার 'গপপো-বুড়া' গল্পের মিতুনের বাবা দয়াল। নিজের বন্ধ্যা জমিতে চাষ হয় না দেখে সে অন্যের মজুরী খাটতো। কাজ না পেলে তাকে উপোস করতে হত। একদিন সরকারের আদেশে সুইচ-গেট তৈরি হলে নদীর জল তার বন্ধ্যা জমিতে এসে পড়ে, আর তাতেই দয়ালের মতো অনেক চাষীর জীবন মুখ তুলে তাকাল। সেই জমিতে ফসল হল। অন্যের জমিতে মজুর খাটা দয়ালের জমিতে এখন অনেকে মজুরী করে। পুকুর, গোয়াল সমস্ত কিছুই হয় তার। এই সুইচ-গেটের ফলে তৈরি হল পাকা-নালা। আর সেই বুড়ো নারুর বাপ গপপো বুড়া পেল পাহারাদারের কাজ। গল্পের শেষে বুড়োর মনের চিত্রটি এভাবে ফুটে উঠে—

> "বুড়ো নারুর বাপও আর সেই দয়ালকে ফিরে পেতে চায় না। সে শুধু চায় সারাজীবন এই সুইচ গেইটের পাহারাদার হয়ে থাকতে। পাহারাটা জরুরী।"[১৩]

শ্রমজীবী মানুষদের নিজেদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি সচেতনতা লক্ষ করা যায় 'বোনাস' গল্পে। দুর্গাপূজার বোনাস তাদের সারা বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার ফসল। এই বোনাসকে কেন্দ্র করে তাদের নানান পরিকল্পনা থাকে। 'বোনাস' গল্পের মূল চরিত্র হল চামেলী। শৈশবে সে তার মা-কে হারিয়েছে। তার মায়ের দৈহিক সৌন্দর্যই অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারা নিম্নবর্গের তাই তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষের কাছে তারা অচ্ছুত। অথচ আয়েসী বাংলোর ভিতরে বসবাস করা মানুষদের লালায়িত দৃষ্টি থেকে তারা সুরক্ষিত নয়। এমনি এক বিরাট বাংলোর বাউণ্ডারি-বেড়ার পেছনে লুঙ্গার আগাছা-কাঁটাঝোপের ঘেরাটোপ থেকে পাঁচদিন পর আবিষ্কার করা হয়েছিল চামেলীর মাকে। চামেলীর মা বেঁচে থাকলে তাদের পরিবারের দুই জনই বোনাস পেত। ঘরে আনন্দ ফিরে আসতো। ঠিক যেমনটা রাধা ও তার পরিবারের চারজন সদস্য অধীর আগ্রহে বোনাসের অপেক্ষা করছে। তবে এই বোনাস তারা সহজে পায় না। টিলাবাবুর মতো মানুষেরা তাদের ঠকাতে পারলেই লাভের বেশি অংশটুকু বাঁচাতে পারে। এই দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষগুলি থেকে বোনাসের পুরোপুরি অংশটুকু বাঁচিয়ে আনে প্রতিবাদী নন্দের মতো মানুষেরা। বাগানে দুর্গাপূজায় ম্যানেজার কর্তৃক যে যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়, সেই খরচটা বোনাসের অঙ্ক থেকেই কেটে নেওয়া হয়। এই গল্পে যমুনাদিদির মুখে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—

> "হুঁ দেখাইত অরাই। কিন্তুক খরচাটা হামদের খিনেলেই কাটে লিত। বোনাস থেকে। আর মজা দেখ— অদের বউ লেড়কারা বসত সামনে। উঁচা চিয়ারে। আর হামরা বসতাম ঘাসে। যে-যার বরা-কম্বলে। অরা দেখত রাজরাণীর মুখ, আর হামরা...।"[১৪]

এই গভীর ক্ষোভ লেখিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপায়ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় এই অন্ত্যজ মানুষগুলি,

> "জন্মায় হালি হালি। ডজনে ডজনে। মরেও যখন তখন।।"[১৫]

এই সব মানুষদের হিসাব কেউ রাখে না। প্রয়োজন পড়ে শুধু রাজনৈতিক ভোট গণনায়। তখন সেই লাভের অংশের পুরোটাই জমা হয় রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের খাতায়।

'ভালোবাসার রঙ' গল্পটিও এই আইনী মার-প্যাঁচের আদলেই রচিত। গুলাবী অশিক্ষিত হলেও বিয়ে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই থানার দারোগা যখন গুলাবীকে বলে, হরিয়া তার স্বামী এবং স্বামীকৃত দৈহিক স্পর্শ কোনোভাবেই ধর্ষণ নয় তখন সেই পুচকে গুলাবী বলে উঠে,

> "রাখো তোমার আইন। আইনের কি মা-বাপ নেই তোমার?... জোর জবরদস্তি জোর জবরদস্তিই। হরিয়া বলৎকারী তুমি লেখ—"[১৬]

কিন্তু তার জবানবন্দি কোনোভাবেই থানার রিপোর্টে লেখা হল না। তাই,

> "যেতে যেতে গুলাবী বলে-হরিয়ার বাড়ির মুর্দাঘরে আর ফিরছি না দারোগা। জিন্দালাশ হয়ে বাঁচতে চাই না আমি। আর তোমার আইনের তো মা-বাপ নেই। ফরিয়াদ করে কী পাব।"[১৭]

প্রান্তিক সমাজের মানুষদের এই রূঢ় আইনীবোধ জয়া গোয়ালা তাঁর গল্পের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

(পাঁচ)

উচ্চবর্গের মানুষ নিজের অধিকার সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন। তারা রাজনৈতিক-সামাজিক বিভিন্ন মতাদর্শকে নিজেদের মতো করে গুছিয়ে বা আয়ত্ব করে নিতে পারে। বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে এই আয়ত্ববোধটি অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের এই বোধশক্তিটি নেই বলা চলে। তারা সহজ সরল। কোনোধরণের ছলনাপূর্ণ কাজের প্রতি তাদের বুদ্ধি ততটা চলে না। ফলে, এই সহজ সরল মানুষকে ভুলিয়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলের শিশু-মেয়েদের নিয়ে পাচারকারী চক্রের এক বৃহৎ ব্যবসা দেখা যায়। জয়া গোয়ালা এই বিষয়টিকেও 'চাঁদের পাহাড়ে' গল্পটিতে মুগলী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুগলী শৈশবে মা হারানো ছেলে। তাই পাচারকারীরা তাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করানোর লোভে তার সামনে চাঁদের পাহাড় নামক একটি বিশেষ প্রলোভনের সৃষ্টি করে। এই শিশু পাচারকারী দলের মানুষের এই অঞ্চলে শনপাপড়ি,

আইসক্রিমওয়ালা রূপে অভ্যুদয় ঘটে। তারা শিশুর মনের খবর জেনে ভুলিয়ে-ভালিয়ে জালের ফাঁদে ফেলে সোজা পাচার করে দেয়। মুগলীর ক্ষেত্রেও তাই হয় । কিন্তু সে বেঁচে যায় রাজা নামক একটি যুবকের জন্য। রাজার প্রখর বুদ্ধিতেই প্রথমে ত্রিপুরায় দুই দিনের জন্য হরতাল ডাকা হয়। এই দুইদিনের বন্ধে মুগলীকে তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়। অবশেষে তার হদিশ মেলে জঙ্গলের পরিত্যক্ত ইট ভাঁটায়। এই হরতাল একদিকে একটি জীবন বাঁচায় অন্যদিকে এই হরতাল রুজি-রুটির জন্য খেটে খাওয়া মানুষদের পেটে উপোসও ডেকে আনে—

> "রিকশাওয়ালাটা বলছিল যারা হরতাল ডাকে, লাভের জন্যই ডাকে। লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই তাদের। চিন্তাও নেই তাই। চিন্তা তাদের যারা দিন আনে দিন খায়। তারা জানে হরতাল মানেই পেট উপোস...।"[১৮]

ত্রিপুরা এবং গোটা ভারতবর্ষে নারী শোষণের বিষয়টিকেও জয়া গোয়ালা তাঁর গল্পে শনাক্ত করতে ভুল করেননি। 'ঝিঙাফুল' গল্পটিতে হারিয়ে যাওয়া দুর্গীর কোনো সন্ধান মেলে না। বাগানের মালিকরাও সেই অজানা রহস্যটিকে জনসমক্ষে বের হতে দেয় না। অসংখ্য মেয়ে এভাবেই অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অনেক সময় পরিজন তাদের খোঁজ করলেও সেখানে থাকে না পুলিশের কোনো হস্তক্ষেপ। লোভী মানুষের কামনার অন্তরালে এভাবেই ঢাকা পড়ে অসংখ্য নারী জীবন। যার হদিশ কোনো রিপোর্টে লেখা থাকে না কিংবা রাখা হয় না। এই জীবনগুলি কেবল জন্ম ও মরণ এই দুই সত্তার মধ্যেই বেঁচে থাকে।

(ছয়)

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কথাসাহিত্যিকরা কেবল মনগড়া কাহিনি রচনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। মানব জীবনের বিপর্যয়, অস্তিত্ব রক্ষার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়কেও লেখকেরা তাঁদের কলমে তুলে ধরেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার সাহিত্যও ভিন্ন কিছু নয়। জয়া গোয়ালার গল্প তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই সাহিত্যিক রূপায়ণ। যে সমাজে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেই অখ্যাত চা শ্রমিকদের জীবনধারাকে তিনি মুখের ভাষাসহ সাহিত্যের পাতায় তুলে এনেছেন। যাদের অস্তিত্বের খবর কেউ রাখে না, সরকারি হিসেবের খাতায় যে মানুষগুলোর কোনো উল্লেখ নেই, সেই মানুষগুলোর বঞ্চনার কথাই তিনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও কঠোর জীবন সংগ্রামের চিত্র তাঁর প্রতিটি গল্পে ধরা পড়ে। তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে রেখে গেছেন ইতিহাসের দরজা খোলার চাবিকাটি। ত্রিপুরা তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই অবদানের ঋণ অপরিশোধ্য।

Reference:

১. চৌধুরি, কথাকলি, (প্রকাশক) জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, মুখাবয়ব প্রকাশন বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৯, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ১২
৩. তদেব, পৃ. ৬২২
৪. তদেব, পৃ. ৮০১
৫. তদেব, পৃ. ৮০৯
৬. তদেব, পৃ. ৮১৮
৭. তদেব, পৃ. ৮১৯
৮. তদেব, পৃ. ৮২৪
৯. তদেব, পৃ. ৮৩৩
১০. তদেব, পৃ. ৮৩৩
১১. তদেব, পৃ. ৮৩৮
১২. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ১৩
১৩. তদেব, পৃ. ৮১৬

১৪. তদেব, পৃ. ৭৯৩

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশির্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩ পৃ. ৬৬

১৬. চৌধুরি, কথাকলি, (প্রকাশক) জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, মুখাবয়ব প্রকাশন বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৯, পৃ. ৬৮০

১৭. তদেব, পৃ. ৬৮০

১৮. তদেব, পৃ. ৯৪৫

Bibliography:

জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, প্রকাশক কথাকলি চৌধুরী, মুখাবয়ব প্রকাশন বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০১৯

ভদ্র, গৌতম, নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রকাশক- বীজেশ সাহা, প্রতিভাত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮